ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/015

মণিপুরি ও বাঙালি সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব ও মেলবন্ধন

ওয়ার্দা রিহাব*
সাদিয়া জিসান ঋতু*

Abstract: The research explores the cultural interconnection between the Gaudiya Vaishnavism of Bengal and Manipuri culture, highlighting the historical influences that have shaped their relationship. It reveals that even before the introduction of Gaudiya Vaishnavism in Manipur, cultural ties were established through kirtana singers, which later deepened into religious associations. The influence of Bengali culture is evident in Manipuri language, literature, music and dance, enriching the cultural landscape of Manipur. Notably, Rabindranath Tagore played a crucial role in popularizing Manipuri dance and extending its reach beyond geographical boundaries. The integration of Manipuri weaving into the Bengali textile industry further exemplifies the mutual links between the two communities. The arrival of Manipuri people in Bangladesh has fostered the thriving exchange, leading to the flourishing of Manipuri language and literature under Bengali influence. This dynamic interplay allows Manipuri artists in Bangladesh to practice their cultural traditions while also embracing Bengali culture, with Bangladeshi artists actively promoting Manipuri dance. Despite the significant impact of Bengali culture, Manipuri culture has maintained its unique identity, enriching Bengali traditions with its diversity. Ultimately the ongoing cultural exchanges between Bengali and Manipuri have resulted in a rich culturar fusion. This paper presents in-depth

* প্রভাষক, নৃত্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যশিল্পী ও গবেষক

analysis of these interactions, emphasizing the evolving nature of cultural identity and universal language of culture itself.

মুখ্যশব্দ: মণিপুরি, বাঙালি, নৃত্য, সংস্কৃতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

১. ভূমিকা

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৬০০ ফুট ওপরে চতুর্দিক পর্বতমালা বেষ্টিত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক মালভূমি ‘মণিপুর’ রাজ্য (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। এর পশ্চিমে আসাম, উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণে মিজোরাম। মণিপুর রাজ্যের আয়তন ২২,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার (মুস্তাফা, ২০২২)। ২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী মণিপুরের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষের অধিক (মুস্তাফা, ২০২২)। অধিকাংশ মণিপুরিরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তবে কিছু সংখ্যক মণিপুরিরা আদি ধর্ম সনামহীর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। বাংলাদেশে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনের ইতিহাস প্রায় তিনশো বছরের। বর্তমানে তারা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় বসবাসরত। বাংলাদেশে বসবাসকৃত ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মণিপুরি নৃগোষ্ঠী (সৌরভ, ২০১৯)। বাংলাদেশে মণিপুরি জনসংখ্যা ১৬ হাজারের অধিক এবং তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মানুসারীদের সংখ্যাই বেশি (মুস্তাফা, ২০২২)। বাংলাদেশের মণিপুরিদের মধ্যে তিন ধরনের পরিবার দেখা যায়, তবে বর্তমানে একক এবং বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা বেশি। মণিপুরি সমাজে নারীদের অবস্থান সম্মানজনক এবং সকল ক্ষেত্রেই তাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় (সৌরভ, ২০১৯)। মণিপুর রাজ্য ও বাংলার ভৌগোলিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও মণিপুরি ও বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব ও মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। একটি সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ লাভে কিছু বিষয়ের প্রভাব বিদ্যমান, যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংস্কৃতির রূপান্তর ও পরিবর্তনের ইতিহাস, ভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান, গ্রহণ ও বর্জন, ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় প্রভাব, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি। সংস্কৃতির ক্ষেত্র ও পরিধি বিশাল। এই গবেষণাকর্মে মূলত সংস্কৃতির যেসকল ক্ষেত্রসমূহে মণিপুরি ও বাঙালি তাদের সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত ও সমৃদ্ধ করেছে সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সাহিত্য, তাঁতশিল্প ও পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালি ও মণিপুরি সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সৃষ্টি

হয়েছে তারই গভীরতা আলোচিত হয়েছে এই গবেষণায়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাঙালি সংস্কৃতি পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার সাথে মণিপুর রাজ্যের যোগসূত্রতা বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন:

> বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিমুখী আর একটি স্থলপথের উল্লেখ করিতেই হয়। এ পথটি পূর্ব বাঙলার ত্রিপুরা জেলার লালমাই-ময়নামতি (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান, শ্রীহট্ট-শিলচর) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া, মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া, মধ্য ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। (নিহাররঞ্জন, বা. ১৩৫৬, পৃ. ৯৫)

অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলের পূর্বাভিমুখী পথটি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে এক পর্যায়ে মণিপুরেও প্রবেশ করেছিল এবং মধ্যযুগে মণিপুর ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে সৈন্যরা এই পথকেই ব্যবহার করত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মণিপুরিদের সঙ্গে বাঙালিদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার পূর্ব সীমানার উত্তরে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ, মাঝে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে ছিল লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজ্য। এদের বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, বাংলার সীমা পার্বত্যদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার কিছু সংখ্যক লোকও ছিল বাংলা ভাষী। পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব অন্দোলনের ফলে মণিপুরিদের সাথে বাঙালির যোগসূত্র আরও গভীরতর হয়।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে মণিপুরি জাতি যেভাবে আরও বর্ণময় রূপ লাভ করেছিল, তা বিশ্লেষণ করা;
খ. মণিপুরে শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের ফলে মণিপুরি ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করা;
গ. একটি জাতির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের গুরুত্ব নিরূপণ;
ঘ. বাঙালি সংস্কৃতি যেভাবে মণিপুরি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল তা বিশ্লেষণ করা।

২। মণিপুরি ও বাঙালি সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ঐতিহাসিক প্রমাণ

পনেরোশো থেকে সতেরোশো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংকীর্তন গায়কগণ মণিপুরে অবস্থান করেছিলেন। এমনকি পনেরেশো শতকে বিষ্ণুর উদ্দেশে মণিপুরে একটি মন্দির

স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মন্দিরের সংকীর্তন গায়কগণ ছিলেন বাঙালি। ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা খাগেম্বার শাসনামলে মণিপুরে কীর্তন গায়কদলের উল্লেখ পাওয়া যায় (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। এরই সূত্র ধরে সেই প্রাচীনকালেই মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মণিপুরে প্রবেশ, দুটি জাতির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং মণিপুরি জাতির পরিপূর্ণ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক কাঠামো (গায়ত্রী, ২০১৬)। মণিপুরিরা কখনও নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে জীবনযাপন করেনি। তাদের সংস্কৃতি যেন বৈচিত্র্যময় ও প্রসার লাভ করে সে লক্ষ্যে তারা বাঙালি সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়গুলো নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে গ্রহণ করেছিল (গায়ত্রী, ২০১৬)। এর ফলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি আরও বর্ণময় রূপ লাভ করেছে কিন্তু তাদের মূল ভিত্তি থেকে তারা সরে যায়নি। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন:

> ...তারপর একদিন যখন বাংলাদেশ হইতে বৈষ্ণবধর্ম গিয়া যেখানে প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেইদিন সে তাহার সমাজ জীবনের মধ্যে তাহা বরণ করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ধর্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে। এইখানেই মণিপুর অন্যের উপকরণ গ্রহণ করিয়াও স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে... (সূত্রঃ গায়ত্রী, ২০১৬, পৃ. ১৮০)

অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশ থেকে প্রবেশকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরিরা তাদের ধর্ম পালনের যে মূল ভিত্তি, তার উপর প্রয়োগ করেছিল। ফলে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের স্বকীয়তা হারায়নি। উপরন্তু, বাঙালি সংস্কৃতির যে প্রভাব মণিপুরি সংস্কৃতিতে পড়েছে তা তাদের বিকাশে সাহায্য করেছে। বাঙালির সঙ্গে মনিপুরী জাতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ঘটে মণিপুর-মায়ানমার যুদ্ধের সময়, যা সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল। 'চহী তারেৎ খুন্তাকপা' বা 'সেভেন ইয়ারস ডিভাসটেশন' নামে খ্যাত এ যুদ্ধে, মণিপুরের জনগোষ্ঠী মণিপুর ছেড়ে কাছাড়, আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে (শেরাম, ১৯৯৬)। ত্রিপুরা সেন্সর বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় হইতে অনেক মনিপুরি রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ মণিপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে" (শেরাম, ১৯৯৬, পৃ. ২২)। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই সময়ের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে মণিপুরিদের বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল। চহী তারেৎ খুন্তাকপা-এর পূর্বে, এটি চলাকালীন এমনকি পরবর্তী সময়েও মণিপুরিরা বাংলাদেশে এসেছে। সুতরাং, বাঙালি সংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচয় এবং আদান-প্রদানের প্রমাণ

ইতিহাসেই বিদ্যমান, যা জোরদার হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ফলে ।

৩. মণিপুরে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবেশ এবং সংস্কৃতির নতুন দিগন্তের সূচনা

মনিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করেছিল দুটি পদক্ষেপে। প্রথমে নিম্বাকপন্থি এবং পরে রামানন্দপন্থি। রামানন্দপন্থি বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করেছিল পনেরোশো শতাব্দীতে রাজা কিয়াম্বার শাসন আমলে (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। রাজা কিয়াম্বা সর্বপ্রথম মণিপুরে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যার পূজারি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন একজন বাঙালি ব্রাহ্মণ, তার নাম ভবানীনাথ ভট্টাচার্য (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। অবশেষে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের আমলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় মণিপুরে প্রবেশ করে এবং মণিপুরের রাজদরবার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রাজা ভাগ্যচন্দ্র এ ধর্ম দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ফলে তিনি এ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে রাজ্যধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। মণিপুরি সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন:

> মণিপুরিরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খৃষ্টীয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রসার লাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদিকালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরে হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন;.. (গায়ত্রী, ২০১৬, পৃ. ১৭৯)।

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র অত্যন্ত সংস্কৃতি অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর শাসনামলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে, বঙ্গদেশের বৈষ্ণবীয় ধর্ম দর্শনের সংস্পর্শে আসার কারণে মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয় (গায়ত্রী, ২০১৬)। এই পরিবর্তন ও সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটি মূলত দুটি বিষয় দ্বারা সংগঠিত হয়েছিলো যেমন: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ এবং মণিপুরিদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ভিত্তি। কপিলা বাৎস্যায়ন এ বিষয়ে বলেছেন, “It is the Vaishnava content which has been superimposed on the existing layers of artistic performance.” (Vatsyayan, 1976, p.138). এই পুরো প্রক্রিয়াটি সংগঠিত

হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ ভাগে এবং এর মাধ্যমে মণিপুরি সংস্কৃতি একটি শাস্ত্রীয় কাঠামো খুঁজে পেয়েছিল, যা পরবর্তীকালে মণিপুরি নৃত্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছে।

৩.১ সংগীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের উপর প্রভাব

মণিপুরিদের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের যে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার একটি অনন্য প্রভাব পড়েছিল মণিপুরিদের সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের উপর এবং রাজা ভাগ্যচন্দ্রের শাসনামলে এর যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র রাস ও নটসংকীর্ত্তন নামে দুটি ধর্মীয় নৃত্যের প্রচলন করেন (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। তাঁর সময়ে যে শুধু এ দুটি নৃত্যেরই প্রবর্তন হয়েছিল তা নয়, বরং সমগ্র নৃত্য ব্যাকরণ, সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্র সর্বত্রই বাঙালির বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মণিপুরি নৃত্যের দুটো দিক রয়েছে।

১। বৈষ্ণব পূর্ববর্তী মণিপুরিদের নিজস্ব লৌকিক দেবদেবী এবং লোককাহিনি ভিত্তিক নৃত্য। এদের মধ্যে রয়েছে মাইবী জাগোই, লাইহারাওবা, থাবল চোংবা, খম্বা থৈবী, যুদ্ধ নৃত্য থাং-তা ইত্যাদি (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। মাইবী জাগোই মণিপুরিদের প্রাচীনতম নৃত্য। এ নৃত্যে ব্যবহৃত নৃত্যমুদ্রাগুলোকে ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম নৃত্যমুদ্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন বলে মনে করেন (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)।

চিত্র ১: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত রাসনৃত্যের দৃশ্য
(গুগল থেকে সংগৃহীত)

২। বঙ্গদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত নৃত্য, যেগুলো রাজা ভাগ্যচন্দ্রের তত্ত্বাবধায়নে নির্মিত, যেমনঃ রাসলীলা, কৃষ্ণলীলা, রাখালনৃত্য, খুবাক ঈশৈ, নটসংকীর্ত্তণ বা নটপালা, পুংচোলম, করতাল চোলম, মন্দিরা নর্তন, হোলিপালা, বাসক ফাংনবা ইত্যাদি (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। তাঁর রাজত্বকালেই নির্মিত হয় পরিমার্জিত কীর্তন। তিনি মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ও ভঙ্গিপারেঙ প্রবর্তন করেন (গায়ত্রী, ২০১৬)। এই রাসনৃত্যে বাঙালি কীর্তন সংগীতের ভূমিকা রয়েছে। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "রাজা ভাগ্যচন্দ্র আসামের যাত্রা, বাংলার কীর্তন এবং মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে রাসনৃত্য নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করেন" (গায়ত্রী, ২০১৬, পৃ. ১৮২)। এই সময়ে নৃত্যগুরুরা নটপালায় নতুন নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন। যেমনঃ বঙ্গদেশ পালা, নটসংকীর্তন, ধ্রুমেল ইত্যাদি (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। এ সময়ে সংকীর্তন এবং রাসলীলা মণিপুরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মণিপুরিদের এসব নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে পুং বা মৃদঙ্গ নামক এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। এই পুংবাদ্য বাঙালি বাদ্যযন্ত্র খোলের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল। অন্যদিকে, বাংলার রামতাল বাদ্যকে মণিপুরি সংগীত উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল মনিপুরি করতাল (শেরাম, ১৯৯৬)।

(গুগল থেকে সংগৃহীত)

চিত্র ২: বাঙালির মাটির তৈরি খোল বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রেরণায় তৈরি মণিপুরি বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ। প্রথম চিত্রটি খোল এবং দ্বিতীয় চিত্রটি পুং বা মৃদঙ্গ।

এ দুটি বাদ্যযন্ত্র মণিপুরিদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। মণিপুরি নৃত্যের গানগুলো সবই জয়দেব, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং বিদ্যাপতির পদাবলি কীর্তন। কেননা, বৈষ্ণবসাহিত্য

এবং সংগীত হচ্ছে মণিপুরি নৃত্যের আত্মাস্বরূপ। বাসক ফাগুনবাতে নায়িকাভেদের অভিনয় নৃত্য, রথযাত্রার করতালি নৃত্য (খুবাক ঈশৈ), বাংলার কীর্তনভিত্তিক নৃত্যগীত, মণিপুরিদের প্রাচীন নৃত্যধারার সংমিশ্রণ এবং বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে মণিপুরে যে নতুন আঙ্গিকের নৃত্যশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল, যা কঠোর নিয়মে আবদ্ধ এবং গীত, বাদ্য, তাল, লয় ও বেশভূষার ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তা পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)।

৩.২ ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরিদের ধর্মীয় উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানেও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। তারা ধর্মীয় জীবনে যে আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করে থাকে তার একটি আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এসব উৎসব অনুষ্ঠানের সাথে সংগীত, বাদ্য ও নৃত্য একই সূত্রে গাঁথা। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই তারা সমান গুরুত্বের সাথে নৃত্যগীত করে থাকে কেননা, তাদের সংগীত ও নৃত্যগুলোও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবেই রচিত (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩) এবং নৃত্যগীতের সঙ্গে ধর্মীয় দিকটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মণিপুরিদের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জলকেলি, দুর্গাপূজা, ঝুলনযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। এ উৎসবগুলো মণিপুরে বিশেষভাবে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতে মহিলারা সংকীর্তন অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার গুণগান ও মহিমা প্রকাশক সংগীত পরিবেশনা করেন। একে নুপীপালা বলা হয় (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। নুপীপালায় মহিলারা মন্দিরা সহযোগে নৃত্যগীত করেন। হিন্দু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মণিপুরিদের পালিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হচ্ছে রথযাত্রা। এতে কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিশেষ কাহিনিগুলো গান, নৃত্যনাট্য বা কীর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এই উৎসবের পর অনেক স্থানে নন্দোৎসবও পালন করা হয়। এছাড়া জলকেলি, স্নানযাত্রা, হরিউত্থান, হরিশয়ন, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি উৎসবগুলোও মণিপুরিরা পালন করে থাকে।

৩.৩ ভাষা ও সাহিত্যে প্রভাব

ভারতের মণিপুর রাজ্যে বসবাসরত মণিপুরিদের মাতৃভাষা 'মৈতৈ' বা মণিপুরি ভাষা (শেরাম, ১৯৯৬)। অন্যদিকে, বাংলাদেশে বসবাসকৃত তিনটি মণিপুরি সম্প্রদায়ের (মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পাঙান) মধ্যে দুই ধরনের ভাষা প্রচলিত। তাদের মধ্যে একটি মৈতৈ লোন ও অপরটি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা (রণজিত, ২০১৮)। মৈতৈ লোন তিব্বতি-বর্মী পরিবারের কুকি-চীন শাখার অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে বাংলা ভাষা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, মৈতৈ বা মণিপুরি ভাষায় মৈতৈ ও বাংলা লিপি, অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় দেবনাগরি ও বাংলা লিপি ব্যবহৃত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে যুদ্ধবিগ্রহজনিত কারণে ইন্দো-এরীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী কুমিল্লা, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী কিছু অঞ্চল থেকে এসে মণিপুরের লম্মাংদোং অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তারা পরবর্তীকালে কালিশা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল (শেরাম, ১৯৯৬)। মহারাজা গম্ভীর সিংহ ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দো-এরীয় সকল জনগোষ্ঠীকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে আখ্যায়িত করেন (শেরাম, ১৯৯৬)। নবগঠিত এই বিষ্ণুপ্রিয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কালিশা (কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের), ময়াং (কাছাড় অঞ্চলের) এবং লৈমনায় ও নিংথৌনায় (আসামের) জনগোষ্ঠী। কে পি সিনহা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাকে ইন্দো-এরীয়ান বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই ভাষার সাথে উড়িয়া, অসমীয়া ও বাংলা ভাষার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে, জি এ গ্রিয়ারসন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাথে অসমীয়া ভাষার মিল খুঁজে পেয়েছেন এবং এ ভাষাকে 'ভালগার বেঙ্গলী' বলে অভিহিত করেছেন। এ কে শেরাম এ সম্পর্কে বলেছেন:

> কিন্তু যেহেতু তখনও বাংলা তার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো সুতরাং সেই জনগোষ্ঠী যে বাংলা ভাষাকে তাদের মুখের ভাষা হিসেবে মণিপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা ছিল বাংলার আদিরূপ-বর্তমান বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। জর্জ গ্রীয়ারসন সম্ভবতঃ এটাকেই 'ভালগার বেঙ্গলী' বলে অভিহিত করেছেন (শেরাম, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মণিপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের বাসকৃত অঞ্চলসমূহে বাংলা ভাষার প্রচলন ও প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং সঙ্গত কারণেই বিষ্ণুপ্রিয়াদের ভাষায় বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন দুই সম্প্রদায়ের (মৈতৈ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া) একত্রে বসবাস করার ফলে মৈতৈ মণিপুরিদের মধ্যেও বাংলা ভাষার প্রচলন হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাকে বাংলা ভাষার একটি উপ-ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন (শেরাম, ১৯৯৬)। বিষ্ণুপ্রিয়া ঐতিহাসিক সেনা সিংহ এ সম্পর্কে বলেন, "পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালার উপভাষার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাদৃশ্য বহুল। সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা আর্য্য-সংস্কৃত ভাষার পৌত্রী বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না" (শেরাম, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯)। মণিপুর-মায়ানমার দীর্ঘ সাত বছর যুদ্ধ চলাকালীন মণিপুরের জনগণ মৈতৈ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে। মণিপুরের তৎকালীন রাজা, সৈন্য এবং প্রজারাও সিলেটে এসে আশ্রয়

নেন। পরবর্তীকালে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মণিপুরি জনবসতি বাড়তে থাকে এবং ধর্ম ও শিক্ষার সূত্র ধরে মণিপুরিদের সাথে নতুন করে বাংলা ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয় (শেরাম, ১৯৯৬)। বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা মণিপুরিদের মধ্যে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলন হয়। তবে এর আগেও মণিপুরে বাংলা লিপি প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর একটি তামার মুদ্রায় বাংলা লিপির ব্যবহার প্রথম দেখা যায় (দর্শনা ও কলাবতী, ১৯৯৩)। এ কে শেরাম সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় লিখেছেন:

> পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের শাসনামলে বাংলা অঞ্চল থেকে আগত চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থাবলি, যা বাংলা ভাষায় রচিত, সেগুলোর সাথে অধিকতর নৈকট্য সৃষ্টির প্রয়োজনে মণিপুরি লিপির পরিবর্তে বাংলা লিপিতে মণিপুরি ভাষা লিখার পদ্ধতি প্রচলিত হয় এবং ক্রমশ তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই থেকেই মণিপুরি ভাষা বাংলা লিপিতেই লিখিত হয়ে আসছে (শেরাম, ২০২০)।

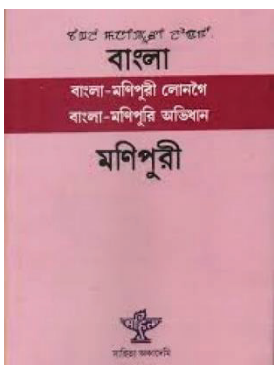

চিত্র ৩: বাংলা থেকে মণিপুরি ভাষার অভিধান।
(গুগল থেকে সংগৃহীত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম মণিপুরিদের মাঝেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ কারণেই মণিপুরি ভাষায় সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য (মুস্তাফা, ২০২২)। প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যদিওবা রবীন্দ্রনাথ মণিপুরে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর রচিত গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক ঠিকই মণিপুরিদের কাছে পৌছে গেছে মণিপুরি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদকারীদের মধ্যে মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবী, থোইবা দেবী, আই আর বাবু,

রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ-এ অংশাবম মীনকেতন, কোঙ্গৌজম তোম্বা, অরিবম শ্যাম শর্মা, এন কুঞ্জমোহন বিশেষ অবদান রেখেছেন (মুস্তাফা, ২০২২, পৃ. ১৯৫)। রবীবন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক, গল্প ও কবিতাকে মণিপুরি ভাষায় অনুবাদ করে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিসর্জন, রক্তকরবী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রাজা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, ক্ষুধিত পাষাণ, মুক্তধারা, ডাকঘর, কঙ্কাল, দুরাশা, বিদায় অভিশাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলী* কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ অনূদিত ইংরেজি থেকে মণিপুরি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে (মুস্তাফা, ২০২২, পৃ. ১৯৫)। বাংলাদেশে মণিপুরি জাতিসত্তার দীননাথ সিংহ তাঁর মাতৃভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলোর বাইরেও বাংলা ভাষায় একাধিক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন (রণজিত, ২০১৮, পৃ. ১২৯)। বাংলাদেশে যে কয়েকজন হাতে গোনা মণিপুরি ও বাংলা ভাষার কবি ও সাহিত্যিক রয়েছেন তাদের মধ্যে শুভাশিস সিন্হা অন্যতম, যিনি বাংলা ও মণিপুরি (বিষ্ণুপ্রিয়া) ভাষায় সমানভাবে কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখছেন যা মণিপুরি তথা বাংলা সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করছে (রণজিত, ২০১৮)।

তাই বলা যায়, মণিপুরি সাহিত্যে প্রকৃত আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং তা বিকশিত হয় বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শ্রী চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এবং ধর্মীয় দর্শনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনরে ফলেই মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং মণিপুরি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে পড়ে। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মণিপুরি ভাষায় অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সহ বিশ্ব সাহিত্যের মহৎ রূপকারদের অনন্য সাহিত্যকর্ম (শেরাম, ১৯৯৬)।

৪. বিশ্বব্যাপী মণিপুরি নৃত্যের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করেছেন এবং তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নৃত্যকলা। শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে তিনি ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। *জাভাযাত্রীর পত্র*-এ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র

সঙ্গীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, তা হলে সেটা হয় নাচ... (রবীন্দ্রনাথ, বা. ১৩৩৬, পৃ. ৯৬)।

চিত্র ৪: ১৯৩৪ সালে শ্রীলঙ্কায় 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবং এই নৃত্যদলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মণিপুরি নৃত্যগুরু নবকুমার সিংহ।
(গুগল থেকে সংগৃহীত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরি রাসনৃত্যকে বহির্বিশ্বে সুপরিচিত করেছিলেন। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে সিলেট সফরের সময় তিনি মণিপুরি রাসনৃত্য দেখে অভিভূত হন (শেরাম, ১৯৯৬)। বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলিভিত্তিক মণিপুরি রাসনৃত্যের আঙ্গিক, কোমলতা, বিনম্র ভঙ্গিমা, বেশভূষা, অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ এবং সৌন্দর্য তাঁকে এই নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। অচিরেই তিনি শান্তিনিকেতনে মনিপুরি নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং এর ফলে মণিপুরের বাইরেও মণিপুরি নৃত্য ক্রমশ পরিচিত ও বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় মণিপুরি ও বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য সাধারণ ও ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের রূপ (মুস্তাফা, ২০২২)। রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও গভীরতা এবং মণিপুরি নৃত্যের বিশুদ্ধ নান্দনিকতার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য থাকায়, শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হয় (গায়ত্রী, ২০১৬, পৃ. ১৯৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্যশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যকে একজন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষককে প্রেরণ করার অনুরোধ জানান। তার কিছুদিন পরেই মহারাজা আগরতলা থেকে মণিপুরি নর্তক মণিপুর রাজপরিবারের সদস্য বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করেন এবং আশ্রমে প্রথম মণিপুরি নৃত্যশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন বুদ্ধিমন্ত সিংহ (শেরাম, ১৯৯৩)। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে আরও অনেক মণিপুরি নৃত্যশিক্ষক গিয়েছেন। ১৯২৬ সালে কবিগুরু নবকুমার সিংহ-কে মনিপুরি নৃত্য প্রশিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এবং সেই সময়ই প্রথম মণিপুরি

নৃত্যপদ্ধতিতে ‘নটীর পূজা’ ও ‘ঋতুরঙ্গ’ অনুষ্ঠিত হয় (গায়ত্রী, ২০১৬)। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সিলেটের ভানুগাছ অঞ্চল থেকেও নীলেশ্বর মুখার্জি নামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নৃত্যশিক্ষক ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত ছিলেন (মুস্তাফা, ২০২২)। শান্তিনিকেতনে সিনারিক সিং রাজকুমার ও নীলেশ্বর মুখার্জি নৃত্যশিক্ষক হিসেবে থাকাকালীন ‘শ্যামা’, ‘চিত্রাঙ্গদা’ ও ‘চণ্ডালিকা’ নামক এই তিনটি নৃত্যনাট্য প্রযোজিত হয়, যার অন্যতম প্রধান নৃত্যধারা ছিল মণিপুরি নৃত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহে ১৯৩৯ সালে গুরু আতোম্বা সিং শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্য আসেন এবং সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা’ অভিনীত হয় (গায়ত্রী, ২০১৬)। পরবর্তীকালে কবিগুরু শান্তিনিকেতনে নৃত্য বিভাগ চালু করেন এবং সেখানে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন যাদের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা মণিপুরি নৃত্য শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হয়। বর্তমানকালে শান্তিনিকেতন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়, যা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরি নৃত্য বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে বিবেচিত এবং এই বিভাগে মণিপুরি নৃত্য বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি কোর্স চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে ভারত, বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আগ্রহী শিক্ষার্থীরা মণিপুরি নৃত্যের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করছে (মুস্তাফা, ২০২২)। মূলত মণিপুরি নৃত্যের প্রতি কবিগুরুর আগ্রহের কারণেই বাংলাদেশ এবং সারা ভারতে মণিপুরি নৃত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং বহির্বিশ্বেও মণিপুরি নৃত্য পরিচিতি লাভ করে (গায়ত্রী, ২০১৬)।

৫. মণিপুরি তাঁতশিল্প

মণিপুরিদের অন্যতম ঐতিহ্যগত পেশা হলো তাঁতের কাজ (সৌরভ, ২০১৯)। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সিলেট ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি যে বাংলোতে উঠেছিলেন, সে বাংলোর দরজা জানালার পর্দাগুলো ছিল মণিপুরি কোমর তাঁতের তৈরি, যার বয়ন ও শিল্প নৈপুণ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর সমর্থন মেলে সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ-এর উদ্ধৃতিতে:

> বাংলোর বহির্দ্বারে টাঙানো ছিল মণিপুরিদের তৈরি প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো একখানা আচ্ছাদন বস্ত্র। স্থানান্তর থেকে পর্দাখানা আনিত হয়েছিল। ঐ আচ্ছাদন-বস্ত্রে মণিপুরিদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে কবি মুগ্ধ হলেন। ইচ্ছে হলে পর্দাটি

শান্তিনিকেতনের জন্য নিয়ে যেতে পারেন। এ কথা বলায় কবি বললেন, এ যে দিনে দুপুরে ডাকাতি (নৃপেন্দ্রলাল, ১৯৯৮)।

এছাড়াও, শ্রীহট্টে ব্রাহ্মসমাজ মহিলা সমিতি কর্তৃক যখন কবিগুরুকে সম্মাননা জানানো হয়, তখন সে অনুষ্ঠানের টেবিলে যে টেবিল ক্লথটি ছিল, তা মণিপুরিদের নিজস্ব তৈরি। কাপড়টির বুনন এবং কারুকার্য কবিগুরু অত্যন্ত পছন্দ করেছিলেন, ফলে তিনি মণিপুরিদের তাঁত ও তাদের জীবনযাত্রা দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শান্তিনিকেতনে ফেরার সময় তিনি মণিপুরি মেয়েদের তৈরি তাঁতের কাপড়ও কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মণিপুরি নৃত্যের পাশাপাশি মণিপুরিদের বস্ত্র ও বয়নশিল্পও শান্তিনিকেতনের মেয়েদের শেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা-কে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করেন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষক বুদ্ধিমন্ত সিংহ-এর স্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণের জন্য, যার মাধ্যমে মেয়েদের মণিপুরি নাচ ও তাঁতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে (মুস্তাফা, ২০২২)। মণিপুরিদের এই সুনিপুণ তাঁতশিল্প বাংলাদেশেও প্রচলিত হয়। তাঁতশিল্পের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মণিপুরে অনেক আগে থেকেই তাঁতশিল্পের ধারাবহিকতা চলে আসছে। মণিপুরিরা তাদের নিজ গৃহেই বাশের নির্মিত তাঁতে নানা বর্ণের ও বিভিন্ন নকশার পোশাক তৈরি করে থাকে। তাঁতবস্ত্র তৈরির জন্য মণিপুরি নারীদের সুখ্যাতি রয়েছে এবং কাপড় বুননের জন্য তাদের অধিকাংশের নিজস্ব তাঁতও রয়েছে। মণিপুরিরা মূলত নিজেদের পোশাকের প্রয়োজনে তাঁতের কাপড় তৈরি করত, তবে পরবর্তীকালে নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিশেষ করে বাঙালিরাও যেন এই পোশাক ব্যবহার করতে পারে সেই অনুযায়ী পোশাক প্রস্তুত করছে এবং বাজারজাতও করছে। ফলে মণিপুরিদের তাঁতশিল্প সমগ্র বাঙালি সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে (মুস্তাফা, ২০২২)। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাঙালি মেয়েরা মণিপুরি তাঁতের শাড়ি পরিধান করে থাকে। মণিপুরিদের তৈরি তাঁত পণ্যের মধ্যে রয়েছে ফানেক, শাল, ওড়না, সালওয়ার-কামিজ, ফতুয়া, পাঞ্জাবি, গামছা, বিছানার চাদর ইত্যাদি। এছাড়াও বৈচিত্র্যপূর্ণ নকশিকাঁথা এবং বকুলকাঁথাও উল্লেখযোগ্য।

৬. বাংলাদেশে মণিপুরি ও বাঙালির সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণে মণিপুরিরা মণিপুর রাজ্য থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে, ঢাকার তেজগাঁও এবং ময়মনসিংহের দুর্গাপুর অঞ্চলে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নটসংকীর্ত্তন গায়ক ও

মৃদঙ্গবাদক (শেরাম, ১৯৯৬)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মণিপুরিদের সংগীতগুলো তাদের ধর্মীয় জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই জীবনের প্রয়োজনেই বাংলাদেশে অভিবাসিত মণিপুরিরা মন্দির স্থাপন এবং নানা পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে নটসংকীর্ত্তন ও পালাগানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীত চর্চা শুরু করে। অনুমান করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মণিপুরি রাস নৃত্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল (শেরাম, ১৯৯৬)। পাশাপাশি লাইহারাওবা নৃত্য, পেনা ঈশৈ, থাবল চোংবা নৃত্যেরও চর্চা ছিল মণিপুরিদের মধ্যে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিদের দ্বারা কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে দীর্ঘদিনযাবৎ রাস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে (শেরাম, ১৯৯৬)। এছাড়াও সিলেট শহরের মণিপুরিদের বিভিন্ন পাড়ায় শ্রাবণ পূর্ণিমাতে ঝুলনরাস নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলদেশের মণিপুরিরা নিজস্ব মণিপুরি সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতিকেও গ্রহণ করেছে এবং চর্চা করছে। রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রানা কুমার সিনহা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম (শেরাম, ১৯৯৬)। এছাড়া আরও অনেক মণিপুরি সংগীতশিল্পীরা বাংলা গানের চর্চা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশের নৃত্যশিল্পীরা মণিপুরি নৃত্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং সাদরে গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর ভারত সরকার প্রদত্ত আই সি সি আর বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা মণিপুরি নৃত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর করে দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাদের অনেকেই মণিপুরি নৃত্যের নিয়মিত চর্চা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরিবেশনার সাথে যুক্ত আছেন। ঢাকায় বেশ কিছু সংগঠন শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের কাঠামোগত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ছায়ানট, নৃত্যনন্দন, নৃত্যম নৃত্যানুশীলন কেন্দ্র, ভাবনা, ধৃতি নর্তনালয়, সাধনা ও দীক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলোর নৃত্যশিল্পীরা ভারতের মণিপুরি নৃত্যগুরুদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত মণিপুরি নৃত্যের কর্মশালার আয়োজন ও প্রশিক্ষণের দ্বারা নিজেদের চর্চাকে অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানকালে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগ শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে যেখানে বাঙালি শিক্ষার্থীরা মণিপুরি সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও মণিপুরি নৃত্যের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এছাড়াও সিলেটের মণিপুরিদের অয়োজিত বিভিন্ন নৃত্য উৎসবে বাঙালি নৃত্যশিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, একইভাবে বাঙালিদের বিভিন্ন আয়োজনে মণিপুরিদের বৈচিত্র্যময় নৃত্য পরিবেশনা, এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে মধুর এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

৭. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি গবেষণার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ভারতের মণিপুর রাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব রয়েছে সেহেতু এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, বই-পুস্তক, তথ্য উপাত্ত, প্রবন্ধ, জার্নাল এবং ম্যাগাজিনের সহায়তায় তথ্য সংগ্রহ করে তা সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু গুগল ইমেজ ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণার জন্য ৬ জন ব্যক্তিকে আলোচ্য বিষয়ে অর্ধ কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার প্রদানের অনুরোধ করা হয়। তাদের মধ্যে চারজন সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিগত কারণে সাক্ষাৎকার প্রদানে ব্যার্থ হন। ফলে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, যাঁরা যথাক্রমে মণিপুরি নৃত্যশিল্পী, নৃত্য প্রশিক্ষক, গবেষক, নাট্যজন এবং লেখক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদেরকে গবেষণা বিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে দুজন অডিও রেকর্ডিং (audio recording)-এর মাধ্যমে এবং একজন লিখিতভাবে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৩ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর আলাদা করে সাক্ষাৎকার নেয়া হয় এবং গবেষণা বিষয়ক প্রশ্নগুলো প্রত্যেকের জন্য একই রকম রাখা হয়। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ-

ক. ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে মণিপুরি ও বাঙালির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন সময়টিকে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

খ. মণিপুরি ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি (সাংস্কৃতিক/ ধর্মীয়/ ভাষাতাত্ত্বিক বা অন্যান্য) সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল?

গ. বাঙালি সংস্কৃতি মণিপুরিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

ঘ. বর্তমান সময়ে মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা কতটা?

ঙ. মণিপুরি সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতিকে কতটা প্রভাবিত করেছে?

৭.১ সারণি

নং	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম	সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিচয়	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তরিখ ও ব্যাপ্তি	সাক্ষাৎকার সংরক্ষণ পদ্ধতি
১.	শ্রীমতি বিম্বাবতী দেবী	শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যশিল্পী, নৃত্য প্রশিক্ষক ও গবেষক, মণিপুরি নর্তনালয়, কলকাতা, ভারত।	তারিখঃ ০৩/০৩/২০২৪ ব্যাপ্তিঃ ১০ মিনিট	অডিও রেকর্ডিং ও লিপিবদ্ধকরণ
২.	শুভাশিস সিনহা	নাট্য প্রশিক্ষক মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি, ঘোড়ামারা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট।	তারিখঃ ০২/০৩/২০২৪ ব্যাপ্তিঃ ২২ মিনিট	অডিও রেকর্ডিং ও লিপিবদ্ধকরণ
৩.	সান্ত্বনা দেবী	শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক, মণিপুরি রাজবাড়ি, ১, সিলেট।	তারিখঃ ০৩/০৩/২০২৪	লিপিবদ্ধকরণ

সারণি ১: গবেষণা বিষয়ক সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সংরক্ষণের তথ্য

৭.২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের মণিপুর রাজ্যের ভৌগোলিক দূরত্ব তার মধ্যে একটি। এই দূরত্বের কারণে দুটি দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়না। ফলে দুই দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব, তথ্যের অপ্রতুলতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং পারিপার্শ্বিক কিছু প্রভাবক দ্বারা এই গবেষণাটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা বিষয়ক

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সংখ্যা মাত্র তিন জন। তবে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যপ্রদাণকারীর সংখ্যা বাড়িয়ে এবং আরও বড় পরিসরে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে।

৮. সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ

বাঙালির সাথে মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশের সময় হতেই বাংলা এবং মণিপুরের মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বাংলা কীর্তন সংগীত ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবের সূচনা হয়। বাঙালি বৈষ্ণব পদকর্তাদের থেকে বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে মণিপুরিরা তাদের নিজস্ব গায়নরীতি এবং সুরের সংমিশ্রণে নতুন আঙ্গিকের এক সংগীত সৃষ্টি করেছিল, যা 'সংকীর্তন' নামে পরিচিত। এর মধ্যে নটপালা এবং পালা-সংকীর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে বৈষ্ণব কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বিষয়ক ভক্তিবচন গীত হয়। যাকে পদাবলি বলা হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করার ফলে ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে বাংলার সাথে মণিপুরের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা মণিপুরি জনগণের জীবনাচরণ ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মনিপুরিদের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসার সাথে সংগীত, নৃত্য ও পালা-লীলার মধ্য দিয়ে যে নতুন এবং মহৎ সাংস্কৃতিক সমন্বয় লক্ষ করা যায়, তা দুটি জাতির অপূর্ব এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার খোল মণিপুরে এসে হয়েছে মৃদঙ্গ বা 'পুং' এবং বাংলার 'রামতাল'-কে মণিপুরি সংগীত উপযোগী করে তৈরি করা হয় 'করতাল'। বাংলার পদাবলি ও কীর্তন মণিপুরি সুর, তাল ও লয়ের প্রয়োগে সর্ম্পূণ নতুন রূপ লাভ করে। ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ভাগ্যচন্দ্র প্রবর্তিত রাসলীলার গানগুলো ছিল বৈষ্ণব পদাবলির অন্তর্গত এবং যার ভাষা ছিল বাংলা। বাংলার সাথে নৈকট্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মণিপুরি লিপির পরিবর্তে বাংলা লিপিতে মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বাংলা মিডিয়াম স্কুল এবং বাংলা হরফের প্রচলন হয়। যদিও পরবর্তীকালে মণিপুরের বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো মৈতৈ ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলা ভাষার কিছু শব্দ মণিপুরি ভাষায় প্রবেশ করলেও পরবর্তীকালে তার অধিকাংশই মৈতৈ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত অনুবাদ হচ্ছে মণিপুরি সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক ও নৃত্যনাট্য এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাস মণিপুরি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে, যা মুদ্রিত বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। মণিপুরি নৃত্যের বৈশ্বিক পরিচিতি এবং প্রসারে তিনি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত নৃত্যনাট্য ও রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে নৃত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য মণিপুরি নৃত্য থেকে অকাতরে গ্রহণ করেছিলেন। মণিপুরি নৃত্যের তরঙ্গায়িত অঙ্গভঙ্গিগুলো রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব প্রকাশের জন্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে কবিগুরু মনে করতেন। মণিপুরিরা যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষা এই তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলা থেকে গ্রহণ করেছে তেমনি বাঙালি সংস্কৃতিও মণিপুরি সংস্কৃতি থেকে মণিপুরি নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানকালে বাঙালি সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত।

৯. সার্বিক আলোচনা

এই গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশের বহু পূর্বেই বাংলার সাথে মণিপুরের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল কীর্তন গায়কগণের সূত্র ধরে, যা পরবর্তীকালে ধর্মীয় সূত্রে আরও গভীরতর হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে মণিপুরি ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাঙালি সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে সংগীত, বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যে যা মণিপুরি সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরি নৃত্যকে যেমন বর্হিবিশ্বে পরিচিত করেছিলেন, তেমনি মণিপুরি নৃত্যের লীলায়িত ভঙ্গিমা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর রচিত সংগীত ও নৃত্যনাট্যের জন্য মণিপুরি নৃত্যকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত নৃত্যশৈলী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালির কুটির ও বস্ত্রশিল্পে মণিপুরিদের তাঁতশিল্প নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা বাঙালি ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে মণিপুরিদের আগমন ও দীর্ঘ সময় ধরে বসবাসের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্যের পালে যেমন লেগেছে সমৃদ্ধির হাওয়া তেমনি বাঙালি সংস্কৃতির বর্ণবৈচিত্র্যকে আত্মস্থ করে মণিপুরি সংস্কৃতির প্রবাহে যুক্ত হয়েছে নতুন ধারা। বাংলাদেশে বসবাসকারী মণিপুরি শিল্পীরা নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি সমান আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করছে। একইভাবে বাংলাদেশের শিল্পীরা বিশেষ করে নৃত্যশিল্পীরা শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের নিয়মিত চর্চা, গবেষণা ও এর প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত আছেন, যার ফলে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাঙালি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও মণিপুরি সংস্কৃতি কখনই তার স্বকীয়তা হারায়নি, বরং নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য

ও বৈচিত্র্য নিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে করেছে বর্ণিল। তাই বলা যায়, বাঙালি ও মণিপুরি এই দুই সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে।

১০। উপসংহার

সংস্কৃতির দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত এবং তার ভাষা সর্বজনীন। পারস্পরিক গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান। নদীর স্রোত যেমন গতিশীল, তেমনি যে কোনো দেশ ও জাতির সংস্কৃতিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনীয় এবং অগ্রসরমাণ। প্রত্যেক জাতিই বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় উপাচার গ্রহণের মাধ্যমে তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং দিয়েছে স্বকীয়তা। একইভাবে বাঙালি ও মণিপুরিরা তাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজ নিজ সংস্কৃতিকে করেছে উজ্জীবিত। মণিপুরিরা বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও কখনই তা হুবহু অনুকরণ করেনি, বরং মণিপুরের মূল সংস্কৃতির প্রবাহে নিজস্ব রীতিতে যুক্ত করেছে নতুন এক ধারা। মণিপুরি নৃত্যের অপরূপ সৌন্দর্য ও লালিত্যকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যগুলো তথা বাঙালি সংস্কৃতিকে করেছিলেন সমৃদ্ধ এবং মণিপুরি নৃত্যকে দিয়েছিলেন বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশের ফলে মণিপুরি সংস্কৃতিতে বাঙালি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়লেও বর্তমান সময়ে ভারতের মণিপুর রাজ্যের মণিপুরিদের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বাংলাদেশে বসবাসকৃত মণিপুরিদের সাথে বাঙালিদের সর্বদাই চলছে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। ফলে দুটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, যা উপস্থাপিত হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার ১

বিম্বাবতী দেবী, তিনি শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যশিল্পী, প্রশিক্ষক ও গবেষক। তিনি ভারতের মণিপুর রাজ্যের নৃত্যগুরু বিপিন সিংহ এবং কলাবতী দেবীর কন্যা। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মণিপুরি নৃত্যের প্রশিক্ষণ, পরিবেশনা এবং গবেষণার মাধ্যমে শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলো তাঁকে লিখিতভাবে ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি অডিও রেকর্ডিং (audio recording)-এর মাধ্যমে উত্তর প্রদান করেন। বিম্বাবতী দেবীর সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো:

বাংলা থেকে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করেছিল তখন থেকেই বাংলা এবং মণিপুরের মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার কীর্তন সংগীত ও আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবের সূচনা হয়। একসময় মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি বসতি গড়ে ওঠে। বাংলা মিডিয়াম স্কুল ও বাংলা হরফের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে মণিপুরিরা বাংলা হরফের পরিবর্তে পুনরায় মৈতৈ হরফের প্রচলন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত গানের বাস্তব অভিব্যাক্তি প্রকাশের জন্য মণিপুরি নৃত্যকেই সবথেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৃত্যশৈলী হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কারণ মণিপুরি নৃত্যের ভঙ্গিগুলো অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, যা একটির সাথে অপরটি মিশে গিয়ে নান্দনিকতা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরা থেকে মণিপুরি নৃত্যগুরুদের শান্তিনিকেতনে এনে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে মণিপুরি নৃত্য প্রশিক্ষণে নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া রাসলীলা ও নটসংকীর্তনের গানগুলো যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলি থেকে নেয়া হয়েছে, তাই এর ভাষা ছিল বাংলা এবং ব্রজবুলি। পরবর্তীকালে মণিপুরিরা নিজেদের আত্মপরিচয় পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রয়াসে বাংলা ভাষার গানগুলো পুনরায় মৈতৈ ভাষায় অনুবাদ করে। ফলে ভারতের মণিপুর রাজ্যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব ও চর্চা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ পরবর্তী সময়ে বাংলা গান ও আচারবিধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই দুই সংস্কৃতির মেলবন্ধনে যে নব্যসৃষ্ট সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তা মণিপুরিরা এখনো অনুসরণ করে।

সাক্ষাৎকার ২

শুভাশিস সিনহা, তিনি একজন নাট্য প্রশিক্ষক ও লেখক। তিনি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ঘোড়ামারা গ্রামের বাসিন্দা। শুভাশিস সিনহা দীর্ঘদিনযাবত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাধর্মী কাজে নিয়োজিত আছেন। নাট্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাঁকে ‘জাকারিয়া স্মৃতিপদক’, মণিপুরি সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতের আসাম থেকে ‘দিলীপ সিংহ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কারসহ আরও বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলো তাঁকে লিখিতভাবে ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি অডিও রেকর্ডিং (audio recording)-এর মাধ্যমে উত্তর প্রদান করেন, যা নিম্নরূপঃ

প্রশ্নঃ ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে মণিপুরি ও বাঙালির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন সময়টিকে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

উত্তর: মূলত সপ্তদশ শতকে যখন বাঙালি বৈষ্ণব পদকর্তাদের বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে মণিপুরিদের বিভিন্ন গায়নরীতি নিয়ে রাসলীলার প্রবর্তন শুরু হয় ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের শাসনামলে। নটপালা বা পালা সংকীর্তনে অসংখ্য পদ গৃহীত হয়েছে বাঙালি বৈষ্ণব পদকর্তাদের কাছ থেকে, যা মণিপুরি আঙ্গিকের সুর ও গায়কির সংমশ্রিণে নতুন একধরনের সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে, মূলত সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাঙালি ও মণিপুরিদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন হয়েছিল।

প্রশ্ন: মণিপুরি ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি (সাংস্কৃতিক/ ধর্মীয়/ ভাষাতাত্ত্বিক বা অন্যান্য) সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল?

উত্তর: সাংস্কৃতিক বিষয়টি এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। নদীয়া অনুবর্তী হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করে এবং মণিপুরিদের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসার সাথে সংগীত, নৃত্য ও পালা-লীলার মধ্যে দিয়ে যে নতুন ও মহৎ সাংস্কৃতিক সমন্বয় লক্ষ করা যায়, তা দুটি জাতির অপূর্ব এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন: বাঙালি সংস্কৃতি মণিপুরিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর: মণিপুরিদের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যগুলোকে সমৃদ্ধ করতে মণিপুরি নৃত্য থেকে অকাতরে গ্রহণ করেছেন, তেমনি মণিপুরি নৃত্যের বৈশ্বিক পরিচিতি ও প্রসারে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা কতটা?

উত্তর: মণিপুরিরা তাদের নিজস্ব (মৈতৈ লোন) ভাষায় রাসলীলা ও কীর্তন করার চেষ্টা করছেন তবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বাঙালি পদকর্তাদের উল্লেখযোগ্য পদ ও সংগীত এখনও গীত হয়ে থাকে এবং সেদিক থেকে বাঙালি সংস্কৃতির একটা চর্চা এখনও মণিপুরে রয়ে গেছে।

প্রশ্ন: মণিপুরি সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি-কে কতটা প্রভাবিত করেছে?

উত্তর: বাঙালি বৈষ্ণব পদকর্তাদের থেকে বিভিন্ন পদাবলি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে মণিপুরিদের যে নতুন এক সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা বাঙালি সংস্কৃতি থেকে মণিপুরি সংস্কৃতিতে এক ধরনের বিনিময়ের ব্যাপার। মণিপুরিরা যেমন বাঙালিদের বিভিন্ন পদ ও গানগুলোকে গ্রহণ করেছে তেমনি বাঙালিরাও মণিপুরি নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে মণিপুরি সংস্কৃতিতে।

সাক্ষাৎকার ৩

সান্ত্বনা দেবী, তিনি একজন শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যশিল্পী, নৃত্য প্রশিক্ষক এবং সংগঠক। তিনি সিলেটের মণিপুরি রাজবাড়ির বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিনযাবত মণিপুরি নৃত্যের সাথে যুক্ত আছেন। শুদ্ধ মণিপুরি নৃত্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। সান্ত্বনা দেবী সিলেটের 'একাডেমি ফর মণিপুরি কালচার এন্ড আর্টস' এর পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রশ্নগুলোর উত্তর তিনি লিখিতভাবে ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমে প্রেরণ করেন, যা নিম্নরূপ:

প্রশ্ন: ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে মণিপুরি ও বাঙালির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন সময়টিকে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

উত্তর: মণিপুরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ লাভ করে তখন ধর্মীয় সংস্কৃতির কিছু উপাচার মণিপুরে ব্যবহার শুরু হয় তবে তা পুরোপুরি বাংলার মতো নয়, অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে মণিপুরি আবহে। সেটা শুরু হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা চলমান ছিল।

প্রশ্ন: মণিপুরি ও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি (সাংস্কৃতিক/ ধর্মীয়/ ভাষাতাত্ত্বিক বা অন্যান্য) সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল?

উত্তর: প্রায় সকলেই জানেন যে, মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবেশ ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল থেকে। এই ধর্মীয় ঐক্যের সূত্র ধরে বাংলার সাথে এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে মণিপুরের। এই ধর্মের প্রভাব ও প্রসার মণিপুরি জনগণের জীবনাচরণ ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার খোল মণিপুরে এসে 'পুং' বা মৃদঙ্গের রূপ নিল এবং 'রামতাল' মণিপুরি সংগীতোপযোগী করে তৈরি হল 'করতাল'। বাংলার কীর্তন ও পদাবলি মণিপুরে এসে মণিপুরি সুর, তাল ও লয়ের প্রয়োগে সম্পূর্ণ নতুন রূপ

লাভ করলো। এই সময়েই বাংলার সাথে নৈকট্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মণিপুরি লিপির পরিবর্তে বাংলা লিপিতে মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা শুরু হলো। সেকারণে সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলা যাবেনা। আমি মনে করি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা– তিনক্ষেত্রেই মণিপুরিরা বাংলা থেকে গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন: বাঙালি সংস্কৃতি মণিপুরিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

উত্তর: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না। কারণ মণিপুরিদের সামাজিক ব্যবস্থা বাঙালি সমাজ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙালি হিন্দুদের সাথে মণিপুরি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম এক হলেও এবং মণিপুরি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাথে বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনেও রয়েছে অনেক ভিন্নতা। এর মূল কারণ হচ্ছে, মণিপুরিরা কখনই নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেনি। ভাষার ক্ষেত্রেও বলা যায়, মণিপুরি ভাষায় বাংলা শব্দ কিছুটা প্রবেশ করলেও তার অধিকাংশই পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার হচ্ছে। মণিপুরি ভাষায় বাংলা শব্দের যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঠিক সেভাবেই সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, বর্মী, চীনা, ম্যান্ডারিন এসব ভাষার শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা কতটা?

উত্তর: মণিপুরে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা তেমন আছে বলে আমার জানা নেই। তবে বাংলা সাহিত্য নিয়মিত অনুবাদ হচ্ছে মণিপুরি সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক ও নৃত্যনাট্য কখনও মূল বাংলায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মণিপুরি অনুবাদে মঞ্চায়িত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বহু উপন্যাস মণিপুরি ভাষায় অনুবাদ হয়ে মুদ্রিত বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন: মণিপুরি সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি কে কতটা প্রভাবিত করেছে?

উত্তর: বাঙালি সংস্কৃতিও মণিপুরি সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছে, বিশেষত মণিপুরি নৃত্য, যা এখন বাঙালি সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সহায়কপঞ্জি

শেরাম, এ কে । (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের মণিপুরি: ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়। (২০১৬)। *ভারতের নৃত্যকলা*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

দর্শনা ঝভেরী, কলাবতী দেবী। (১৯৯৩)। *শাস্ত্রীয় মণিপুরি নর্ত্তন*। মনিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা।

নৃপেন্দ্রলাল দাশ। (২০১৯)। *শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ*। মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা।

নিহারঞ্জন রায়। (১৩৫৬)। *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*। দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা।

মুস্তাফা মজিদ। (২০২২)। *মণিপুরি*। জার্নিম্যান বুক্স, ঢাকা।

রণজিত সিংহ। (২০১৮)। *বাংলাদেশের মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৩৩৬)। *জাভা-যাত্রীর পত্র*। বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা।

সৌরভ শিকদার। (২০১৯)। *বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিবর্তন*। মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনী, ঢাকা।

Vatsyayan, K. (1976). *Traditions of Indian Folk Dance*. Clarion Books, New York.